Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 59 – 68
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

দেশবিভাগ ও হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প

মহেশ্বর ঘোষ
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : maheswarghosh910@gmail.com

Keyword
দেশভাগ, উদ্বাস্তু, স্বাধীনতা, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, রাঢ়বাংলা, ওপার বাংলা, অবক্ষয়।

Abstract
বাঙালি জাতির জীবনে দেশবিভাগ এক সামাজিক বিপর্যয়। যার ক্ষত আজও বিদ্যমান। বাংলা সাহিত্যে তার কথা বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন লেখকের রচনায়। দেশবিভাগ-কে আশ্রয় করে এখনও পর্যন্ত যে সকল লেখক ছোটগল্প লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হাসান আজিজুল হক। রাঢ়বাংলার রুক্ষ মাটিতে তিনি বেড়ে উঠেছেন। শরীর থেকে কৈশোরের গন্ধ মুছে যাওয়ার আগেই তাকে ফেলে আসতে হয়েছে শৈশবের মাতৃক্রোড়। জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তার তাগিদে স্বজনভূমি ছেড়ে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে নতুন দেশে। তিনি দেখেছেন 'দ্বিজাতি' - তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত এই নতুন দেশ মানুষের আশা, আকাঙ্খা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একদিকে শিকরহীন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা অন্যদিকে সামাজিক অচলাবস্থা মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই অন্ধকার সময়ের চালচিত্র ফুটে উঠেছে হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্পের বহুলাংশ জুড়ে। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে আসা বাঙালি হিন্দুদের দুর্দশার কথাতেই মুখর বাংলা সাহিত্য। সেটা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতও। তবুও এর ভয়াল রূপ প্রকাশে অনেকেই অসমর্থ এবং অনিচ্ছুক। অন্যদিকে যে সকল বাঙালি মুসলমান এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় গেল, এর খবর তেমন পাওয়া যায় না। এই মানুষগুলোর কথাই হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। তিনিও ছিলেন তাদের শরিক। ওপার বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক অবক্ষয় যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার পরিচয় পাব আমরা তাঁর একাধিক ছোটগল্পে। দেশবিভাগ পূর্ববর্তী এবং দেশভাগ পরবর্তী দুই বাংলায় একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু 'দাঙ্গা' আর 'সাম্প্রদায়িকতা'-কে এক করে দেখতে পারেননি তিনি। তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে 'দাঙ্গা' আর 'সাম্প্রদায়িকতার' সম্পর্ক এবং স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন। নির্ভার ভাষারীতি এবং গভীর জীবনবোধের মধ্যে দিয়ে তিনি দেশবিভাগের যে সমাজ ইতিহাসের দলিল লিখেছেন তা অনন্য।

Discussion

বিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় হল দেশবিভাগ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় ভাগ - বাটোয়ারার রাজনীতিতে, সাম্প্রদায়িক বীভৎসতায়। বৃহৎ স্বার্থের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত। এর অনিবার্য পরিণতি হয়ে উঠেছিল দেশবিভাগ। কিন্তু কেন এই বিভাজন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন বহু স্থিতধী মানুষ, লিখিত হয়েছে একাধিক ঐতিহাসিক দলিল। কিন্তু সেই অস্থির সময়ের চালচিত্র, বিভাজনের পরবর্তী সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল, তার সাক্ষ্য দিয়েছে সাহিত্য। দেশবিভাগের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাংলা এবং পাঞ্জাবের অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বাংলা ছোটগল্পে সেই অন্ধকারময় দিনগুলির পরিচয় দিয়েছেন অনেক প্রাজ্ঞ লেখক। হাসান আজিজুল হক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলা সাহিত্যে দেশবিভাগ কেন্দ্রিক একাধিক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। সেই গল্পগুলির অধিকাংশই মূলত ওপার বাংলার স্বজনভূমি থেকে উৎখাত হয়ে আসা হিন্দুদের অবলম্বন করে লেখা। দেশবিভাগ পরবর্তী পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুর্দশা এবং মাতৃভূমি হারানো এই উদ্বাস্তু মানুষগুলির জীবনসংকট, স্মৃতি-মেদুরতা গল্পগুলির মূল উপজীব্য। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষের সংখ্যা এবং তাদের দুরবস্থা এপার বাংলা থেকে যাওয়া মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যে সকল মানুষ এপার বাংলা ছেড়ে ওপার বাংলায় যেতে বাধ্য হল, সেই সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য প্রায় নিশ্চুপ। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে এই না বলা মানুষগুলির জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে পরম যত্নে।

র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলের একটি আঁচড় সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনে হয়ে উঠেছিল গভীর ক্ষত। হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যে এই ক্ষত বারবার হা-মুখ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাঢ়বাংলার মাতৃক্রোর ছেড়ে তাকেও পাড়ি দিতে হয়েছিল ওপার বাংলায়। এই ফেলে আসা দেশ, ফেলে আসা স্মৃতি তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে আসে। জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে লেখেন 'আগুনপাখি', 'সাবিত্রী উপাখ্যান'— এর মতো উপন্যাস, যার ভিত্তিভূমি তাঁর সেই চিরপরিচিত রাঢ়বাংলা। কাঁটাতারের বেড়া অগ্রাহ্য করে এভাবেই তিনি নির্মাণ করেন এক অখণ্ড বাংলার মানচিত্র।

আমাদের গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম 'দেশবিভাগ ও হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প'। তাঁর লেখা ছয়টি ছোটগল্পে দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব চিত্রিত হয়েছে। 'উত্তর বসন্তে', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'মারী', 'খাঁচা', 'দিবাস্বপ্ন' — এই গল্পগুলিকে আশ্রয় করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হবে। দেশবিভাগ পরবর্তী ওপার বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এই বিষয়গুলি তাঁর লেখায় কীভাবে ফুটে উঠেছে তা আমরা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

২

দেশবিভাগ পরবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল মানুষের শিকড়হীন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। জীবিকা এবং জীবনের একাধিক প্রয়োজনে বহু মানুষ ফেলে আসে তার ভিটেমাটি। সেক্ষেত্রে তেমন সংকট তৈরি হয় না, তাদের চোখে থাকে দিন বদলের এক রঙিন ছবি। কিন্তু যাদের সীমানা নির্ধারিত হয় ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দু'টি রাষ্ট্রের কাঁটাতারের বেড়ার দ্বারা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাদের ত্যাগ করতে হয় শৈশবের মাতৃভূমি, তাদের যন্ত্রণার তল খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। হাসান আজিজুল হক নিজে এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই যন্ত্রণার অক্ষরমালা নির্মাণ করা।

দেশবিভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তির সামাজিক এবং মানসিক সঙ্কট এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ইতিপূর্বে বহু সাহিত্যিক। সেগুলি অধিকাংশই ওপার বাংলার ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে আসা শিকড়হীন মানুষের গল্প। অথচ এপার বাংলা থেকে যারা ওপার বাংলায় গেল তাদের পরিস্থিতি কেমন ছিল? কীভাবে ঘটেছিল তাদের সামাজিক অভিযোজন? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন খুব কম মানুষ। দেশবিভাগ নিয়ে ওপার বাংলায়

তেমন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়নি, আজীবন এই আক্ষেপ ছিল স্বয়ং হাসান আজিজুল হকের। তবে শুধুমাত্র সাহিত্য রচনার তাগিদে নয়, দেশবিভাগের যন্ত্রণায় আজীবন তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন।

> "দেশভাগ নিয়ে একটির পর একটি গল্প বা দীর্ঘ উপন্যাস লেখা আমার দায়িত্ব ছিল,কিন্তু কোনোদিন সে পথে এগোনোর সাহস বা সংকল্প সংগ্রহ করতে পারলাম না। তবে বুকের পাঁজর ফাটিয়ে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে একটি দুটি করে গল্প বেরিয়ে এসেছে। ঠিক যেন করাতকলে হৃৎপিণ্ড- চেরাই হচ্ছে এরকম তীব্র কষ্টের সব মুহূর্তে এক একটি গল্প লেখা হয়েছে।"[১]

দেশ বিভাগ সম্পর্কিত তাঁর লেখনী কেবল স্মৃতি রোমন্থন নয়, এক প্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা হয়ে উঠেছে।

'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' গল্পগ্রন্থের 'উত্তর বসন্তে' গল্পে চিত্রিত হয়েছে দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবাংলার বর্ধমান থেকে বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ববাংলায় চলে আসা একটি পরিবারের গল্প। 'দ্বিজাতি'- তত্ত্বের ভিত্তিতে সংঘটিত দেশবিভাগ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে। বাণী এবং তার পরিবার তাই ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাদের জীবনে অপমৃত্যু ঘটেছে স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসার। নতুন দেশ তাদের চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। জীবন তাদের কাছে প্রাণহীন, শুষ্ক, মৃতপ্রায়। একদিকে ছেড়ে আসা দেশের যন্ত্রণা, অন্যদিকে বেঁচে থাকার লড়াই, উদ্বাস্তু জীবনের এই সংকটের পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার।

গল্পটির মধ্যে ঘুরেফিরে আসে অন্ধকারের কথা। দেশবিভাগ বাণী এবং তার পরিবারের কাছে আলো হয়ে ওঠেনি। তার বাবা-কে দেখে মনে হয় অন্ধকারের জীব, তার মা কেবল প্রাণধারণের জন্য বেঁচে আছেন। এই হতাশাদীর্ণ একঘেয়ে জীবন বাণীকে ক্লান্ত করে। তার মনে পড়ে বর্ধমান শহরের লাল রোদের কথা, যা আজ অতীত –

> "সেই রোদ আর কোনোদিন দেখবে না বাণী।"[২]

নতুন দেশ বাণীদের স্বচ্ছল জীবন উপহার দেয়নি, বরং চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। "সকালের খাবার তৈরি হবে। প্রত্যেকে পাবে তিনটি করে শুকনো রুটি আর এক টুকরো গুড়। তারপর এক কাপ চা।"[৩] এই উদ্বাস্তু জীবনের অভিধানে ভালোবাসা শব্দের স্থান নেই। কবীরের প্রেম নিবেদন মুখ থুবড়ে পড়ে। বাণীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কেবলই উচ্চারিত হয় –

> "আমরা রিফ্যুজি, উদ্বাস্তু।"[৪]

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে উদ্বাস্তু জীবনের এক করুণ ও হৃদয় বিদারক ছবি গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের সংকট মানুষকে ঠেলে দিয়েছে এক অতল, অন্ধকার গহ্বরের সম্মুখে। যেখানে কেবল তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পরিত্রাণ নেই। এই গল্পে তেমনই এক কঠোর জীবনসত্যের পরিচয় লেখক দিয়েছেন। দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থানের জন্য একজন বৃদ্ধ পিতা তার আত্মজা-কে পণ্যে পরিণত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কারণ কাঁটাতারের বেড়া তাকে নিঃস্ব করে ছেড়েছে অন্তরে, বাহিরে –

> "দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।"[৫]

হাসান আজিজুল হক একজন অসামান্য ভাষাশিল্পী। উপমা এবং চিত্রকল্পের সাহায্যে এই যন্ত্রণা-কে আরও ঘনীভূত করেছেন।

> "পাখিদের কোন গান নেই এখন।"[৬]

বাংলা সাহিত্যে এমন সংক্ষিপ্ত, নির্ভার অথচ তীক্ষ্ণ সমাজ বিশ্লেষক বাক্য বিরল। গল্পটির শেষ পর্যায়ে শিকড়হীন জীবন যন্ত্রণার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার—

> "আমি যখন এখানে এলাম, আমি যখন এখানে এলাম,হাঁপাতে হাঁপাতে,কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম...তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না-সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম-আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই...তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ-সুহাস হাসছে হি হি হি-আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল,ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো

বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ,করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ- প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো- এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?"[৭]

দেশবিভাগ পরবর্তী এপার বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা এবং রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। উদ্বাস্তু শিবিরের ভয়াবহ সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে আজও আমাদের হাড়-হিম হয়ে যায়। হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থের 'মারী' গল্পে ওপার বাংলায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি এবং তাদের দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। ওপার বাংলায় এক স্কুল বাড়িতে চারশো-জন রিফ্যুজি এসেছে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে এবং সরকারের কাছে এই রিফ্যুজি-রা ছিল গলগ্রহ। রকিবের কথায় তা স্পষ্ট হয় —

"যেহানে ইচ্ছে সেহানে যাক, আমরা মরতিছি নিজেগো জ্বালায়, এ্যাহন রিফুজি আলি বাঁচবে নে একডা লোক, কনদিনি!"[৮]

মতলেব সাধু এবং নফর খান-দের মতো মানুষেরা এই অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়ায়। যদিও তাদের সহায়তার মধ্যে ছিল মহত্ত্ব অর্জনের একপ্রকার প্রচেষ্টা –

"মহৎ মহৎ গন্ধ ছাড়ে ওদের গা।"[৯]

কিন্তু তাদের মধ্যেই রিয়াজদ্দির মতো স্বার্থসিদ্ধিহীন পরোপকারী মানুষও আছে,তার কথায় –

"রিফ্যুজিরা তো আমাদের ভাই!"[১০]

অন্যদিকে এই উদ্বাস্তু-দের পুনর্বাসন এবং জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের অকর্মণ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। অস্বাস্থ্যকর খাবার, খাবারের অপ্রতুলতা এবং অসহায় মানুষগুলোর ত্রাণ নিয়ে চক্রান্ত শেষমেশ তাদের মৃত্যুমুখে পতিত করে—

"কবীর দেখলেন আধশোয়া একটি মানুষ বমি করছে, অন্ধকারে চকচক করছে তার চোখ। তখন তিনি দেখলেন স্কুল বাড়িটার সমস্ত জায়গা থেকে—হলঘর, ক্লাসরুম আর ফাঁকা জায়গাটা থেকে অসংখ্য মানুষ আধশোয়া অবস্থায় বমি করছে আর তাঁর দিকে চকচকে চোখ মেলে চেয়ে হাঁফাচ্ছে। এবং তারপরে মূক মাটির ওপর হলুদ রঙের পাখি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।"[১১]

'উদ্বাস্তু' শব্দটির অর্থ অনেক বিস্তৃত,এর কোনো একমুখী ব্যাখ্যা হতে পারে না। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পগ্রন্থের 'খাঁচা' গল্পে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। দেশবিভাগ পরবর্তী ওপার বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চালচিত্রের বদল ঘটে, শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে ওঠে। সবসময় একপ্রকার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয় তাদের। চিরপরিচিত মাতৃভূমি হয়ে যায় অপরিচিত। তাই তাদের আবাসস্থল হয়ে ওঠে খাঁচার নামান্তর। এই জীর্ণ জীবনের ক্লেদ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে অম্বুজাক্ষ এবং সরোজিনী। বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিবার নিয়ে তারা চলে আসতে চায় এপার বাংলায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের আসা স্থগিত হয়ে যায়, অম্বুজাক্ষ স্বদেশের নাড়ীর টান কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অম্বুজাক্ষর পরিবার বাস্তুচ্যুত নয়,কিন্তু গল্পটির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের অন্তরের নির্বাসন।

"ভারি পরিশ্রম গেছে সারাজীবন। চুপচাপ বিশ্রাম নেব সেখানে গিয়ে। আমাকে আর খাটাতে পারবে না তোমরা। একটা ছোট্ট বাগান করে দিও। শিউলি,বকুল,চাঁপা,গোলাপ এই সব গাছ দিয়ে-এককালে আমাদের যেমন ছিল।"[১২]

সরোজিনীর এই আকাঙ্খা, নির্বাসিত,অন্ধকার জীবনের ছাড়পত্র। 'খাঁচা' গল্পে উদ্বাস্তু জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি নেই। তবু আমাদের কাছে অম্বুজাক্ষের মানসিক সংকটের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিচিত আবাসভূমি থেকে নির্বাসনের যন্ত্রণা।

উদ্বাস্ত মনও আশ্রয় খোঁজে, স্বপ্ন দেখে এক উজ্জ্বল দিনের। 'দিবাস্বপ্ন' গল্পে স্বভূমি পরিত্যাগ করে আসা রহিম বখশের দু-চোখেও এই আশা ছিল —

> "নতুন দেশে আসার সময় একটি কামনা ছিল তার। সে যেন পরিস্কার ঝকঝকে কোনো সকালে সেখানে পৌঁছায়,যাতে একেবারেই পুরো নতুন দেশটা দেখে ফেলতে পারে এবং ছবিটা মৃত্যু পর্যন্ত মনে গেঁথে নিতে পারে।"[১৩]

কিন্তু নতুন দেশ তার সেই স্বপ্নপূরণের দায়ভার নেয়নি। আর তাই তার স্বপ্নময় চোখে বাসা বাঁধে অন্ধকার—

> "সেই যে চোখে অন্ধকার বাসা নিল আর সেটা সরল না।"[১৪]

একদিকে ফেলে আসা দেশের স্মৃতিতে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তাদের জীবনযাপন হয়ে উঠেছে দুর্বহ— তাই এই জীবন সে ফিরে পেতে চায় না আর—

> "এই একই জীবন ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আবার তাকে গোড়া থেকে ফিরিয়ে দিলে সে ঈশ্বরকে নিজেই উক্ত অনুগ্রহ উপভোগ করার অনুরোধ জানাবে।"[১৫]

'দিবাস্বপ্ন' গল্পটি আসলে এক স্বপ্নভঙ্গের গল্প।

> "উনিশ শ চুয়ান্নে যখন প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে আসি তখন দেখি শিয়ালদহ স্টেশনে উড়ে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া, ন্যাকড়া হয়ে যাওয়া লাখ লাখ মানুষ থিক থিক করছে। তাদের মাড়িয়ে ট্রেনে উঠি, ট্রেন থেকে নেমে তাদের মাড়িয়ে মহানগরে আসি। কলকাতা একবারও ফিরে তাকায় না।"[১৬]

কলকাতা যেমন ফিরে তাকায় নি ওপার বাংলার বাস্তহারা মানুষগুলির জন্য,তেমনই পূর্ব-পাকিস্তানও এপার বাংলার বাস্তহীন মানুষদের সহজে গ্রহণ করেনি। ওপার বাংলায় বাস্তুচ্যুত মানুষগুলির অর্থনৈতিক, মানসিক এবং সামাজিক সংকটের পরিচয় পেলাম উপরিউক্ত গল্পগুলির আলোচনার মধ্যে দিয়ে। একদিকে শিকড়ের টান, অন্যদিকে অস্তিত্বের লড়াই এই দুইয়ের টানাপোড়েনে উদ্বাস্ত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। নতুন দেশ, সদ্যোপ্রাপ্ত স্বাধীনতা শিকড়হীন মানুষগুলির প্রত্যাশা পূরণে কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে সেকথার জানান দিয়েছেন গল্পকার হাসান আজিজুল হক।

৩

'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'দাঙ্গা' শব্দ দুটির ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে বিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস। আজ 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে কেবল হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য এবং বিরোধের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের বীভৎসতাকে মোটা দাগে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' হিসেবে চিহ্নিত করতে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু হাসান আজিজুল হক 'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'দাঙ্গা'-র সহাবস্থান মেনে নিতে পারেননি। তিনি শৈশব থেকেই দেখেছেন মানুষের সাম্প্রদায়িক মনোভাব। আমাদের সমাজ যে শতধা বিভক্ত তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে 'সাম্প্রদায়িকতা' মানে কেবল হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য নয়, মানবতার অসম্মান।

> "...সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনা,বৈষম্য বা পীড়ন আমি যাই ভোগ করে থাকি না কেন,আমাদের গ্রামের বাউড়িদের ছেলেটা কিংবা ডোমদের ক্লাস ফাইভে পড়া বালকটিও অবিকল আমাদের অভিজ্ঞতাই পেয়েছিল।"[১৭]

এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সমাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং এভাবেই সামাজিক জীবন ক্রমশ অগ্রসরমান। কিন্তু তিনি মনে করেন—

> "দাঙ্গা সবসময়েই ঘটিয়ে তোলা,মোটেই জীবনযাপনের অঙ্গ নয়।"[১৮]

তাই এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। বিশ শতকে দেশবিভাগ পূর্ববর্তী অখণ্ড-বাংলার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার ছবি বাংলা ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। দেশভাগ পরবর্তীতে সেই বীভৎসতা কেমন ছিল, নগরের আগুন কীভাবে গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ-কে গ্রাস করতে থাকে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব হাসান আজিজুল হক রচিত 'পরবাসী' গল্পটির মধ্যে দিয়ে।

গোটা বিশশতকের প্রথমার্ধ জুড়ে একদিকে যেমন দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত মানুষের লড়াই দেখেছে ভারতীয় জনগণ, তেমনই দেখেছে 'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'দাঙ্গা'-র ভয়াল রূপ। দেশবিভাগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ভারতবর্ষের বাতাস একাধিকবার সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষাক্ত হয়েছে। দাঙ্গর উন্মত্ততায় রক্তরাগে রঞ্জিত হয়েছে ভারতবর্ষের মাটি। 'পরবাসী' গল্পে আমরা দেখতে পাই মধ্যরাঢ়ের এক কৃষিপ্রধান গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে এই নারকীয় হত্যালীলার আগুন,যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বশির ও তার পরিবার। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও ওয়াজদ্দির মতো স্বদেশপ্রেমী মানুষ শিকড়ের টান কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই দাঙ্গার আঁচ পেয়ে বশিরের মন যখন পলায়নপর হয়ে ওঠে, তখন ওয়াজদ্দি বলে –

> "তোর বাপ কটো? এ্যাঁ-কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো।"[১৯]

কিন্তু এই স্বদেশপ্রাণ মানুষটির জীবনও কেঁড়ে নেয় দাঙ্গার লেলিহান শিখা। স্ত্রী, পুত্র হারিয়ে বশির আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। দেশের সীমান্তে এসে একজন হিন্দু মানুষ কে মুহূর্তের মধ্যে খুন করে সে বুঝতে পারে পীড়িতের কোনো ধর্ম হয় না।

> "যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়,অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না,সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?"[২০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই দূরদর্শী ভাবনা যে কতখানি সত্য তার পরিচয় আমরা পেয়েছি দেশভাগের মধ্যে দিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর ভিত পোক্ত করতে এই ধর্মীয় বিভেদের বীজ পোঁতা হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে। পরবর্তী কালে আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। তাই এই 'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'দাঙ্গা' কিছুটা পরিকল্পিত এবং নির্মিত ছিল বলে আমাদের মনে হয়। গ্রামীণ পরিবেশে বশির, ওয়াজদ্দি, ভক্তা-দের মতো শ্রমজীবী মানুষদের পরিচয় ধর্ম বা জাতির ভিত্তিতে নয়, অর্থনৈতিক অবস্থান হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই ভক্তার ধান ঝাড়তে বা বিশেকত্তার মতো হিন্দু জোতদারের জমিতে কাজ করতে বশির, ওয়াজদ্দির মতো মুসলমানের কোনো দ্বিধা ছিল না। সমাজের সাথে সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন অনেকদিনের, কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িকতা কেবল হিন্দু-মুসলিম-এ সীমাবদ্ধ নয়। মেহনতি মানুষের শ্রম চিরকাল মালিক-শ্রেণির গোলাজাত হয়,এ গল্পে সেই দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি —

> "শীত যত প্রচণ্ডই হোক না, যতই সামান্য হোক ফসলের পরিমাণ এবং হোক না সেই ফসলের অর্ধেকটাই জমির মালিকের বাড়ি তুলে দিয়ে আসতে, তবু শীত কি করতে পারে?"[২১]

তাই সাম্প্রদায়িকতার পরিমণ্ডল অনেক বিস্তৃত। সেখানে যেমন ধর্মীয় বিভেদ আছে তেমনি আছে ধনী-নির্ধন, শাসক-শাসিত, অত্যাচারী-পীড়িত ইত্যাদি একাধিক শ্রেণির বিরোধ। এই ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও গ্রামজীবন সজীব এবং সচল ছিল। কিন্তু দাঙ্গাবাজের দল এই স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে, বেরিয়ে আসে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত রূপ—

> "পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন একছার কাটচে-কলকাতায় তেমনি কাটচে মোচলমানদের।"[২২]

দেশবিভাগের পরও এই অবস্থার বদল ঘটেনি। বোধশক্তিহীন এই মানুষগুলি তৎকালীন রাষ্ট্রিক অবস্থা দ্বারা তাড়িত। এই গল্পের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে আমরা দেখি স্বজন হারানো বশিরের চেতনা অবলুপ্ত। কিন্তু তার হাতে নিহত হিন্দু মানুষটিকে দেখে সে বুঝতে পারে মৃত ওয়াজদ্দির মুখের সাথে এই মুখের কোনো ফারাক নেই।

পূর্বোক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল 'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'দাঙ্গা'-র স্বরূপ। দেশবিভাগ পরবর্তীতে তার চেহারা কেমন ছিল তার পরিচয় পেলাম 'পরবাসী' গল্পের মধ্যে দিয়ে। মানুষের মনে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল ক্ষমতালিপ্সুর দল তার উৎপাটন সম্ভব হয়নি দেশভাগের পরেও। গ্রাম-জীবন চিরকালই রাষ্ট্রিক দুর্যোগ থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রেখে চলত। কিন্তু এই ভয়ংকর দুর্যোগের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয় গ্রামের সুস্থিত পরিবেশ।

'দাঙ্গা' বা 'সাম্প্রদায়িকতা'-র বিবরণ হয়ে ওঠেনি এই গল্প। বশিরের আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে এই হত্যাযজ্ঞের অন্তর্নিহিত সত্যটি আমাদের সামনে আসে।

৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত, দেশভাগ— এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসে স্বাধীনতা। কাঁটাতারের বেড়া দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ভারতকে টুকরো করে তৈরি হল পাকিস্তান।

> "ঘুণে খাওয়া স্বাধীনতা এসেছে, হাঙরের দাঁতের মতো করাত চালিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। কতো দূরের পাঞ্জাবকে কেটে দুভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে-তার নিজের মাটি, নিজের পানি, ফল, ঘর-সংসারকে ভাগ করে দু'টুকরো ছেঁড়া রুটির মতো একটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানের সঙ্গে, আর এক টুকরোকে লাগানো হয়েছে ভারতের সঙ্গে।"[২৩]

এই অস্থির সময়পর্বে সামাজিক সুস্থিতি বজায় থাকতে পারে না। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ে, দেখা দেয় সামাজিক অবক্ষয়। হাসান আজিজুল হক এই অন্ধকার সময়ের সাক্ষী। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল হয়ে তিনিও পাড়ি দিয়েছিলেন নতুন দেশ পাকিস্তানে। তৎকালীন সামাজিক অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একজন দক্ষ সমাজ-বিশ্লেষক হিসেবে তিনি সেই সামাজিক অবস্থার চালচিত্র তাঁর গল্পেও তুলে ধরেছেন। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'খাঁচা', 'উত্তর বসন্তে' গল্পে দেশবিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক মূল্যবোধ কীভাবে বিনষ্ট হয়েছে তার পরিচয় পেয়েছি আমরা।

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে আমরা একদিকে যেমন দেখতে পাই ছিন্নমূল মানুষের জীবনযন্ত্রণার ছবি। অন্যদিকে সেই বন্ধ্যা সময়ের সামাজিক প্রতিচ্ছবিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন দেশ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। যেখানে বেঁচে থাকার জন্য একজন বৃদ্ধ পিতাকে নির্ভর করতে হয় তার কন্যার শারীরিক উপার্জনের ওপর। ইনাম, ফেকু, সুহাস সেই অন্ধকার সময়েরই ফসল। সামাজিক সুস্থিতি বিঘ্নিত। স্কুলে পড়ার বয়সে সমাজ তাদের ঠেলে দেয় পকেটমারির মতো ঘৃণ্য পেশায়।

> "করবটা কি কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয়—। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছপ— ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি—ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়োয়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি—কি কলাডা করবানে?"[২৪]

তাদের এই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারি সহজেই। সমাজের প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা বেছে নেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন।মানুষের প্রতি মমত্ববোধ লুপ্ত পায়। তাই একজন বৃদ্ধের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পয়সার বিনিময়ে তার আত্মজার শরীর ভোগ করতেও কোনো কুণ্ঠা নেই তাদের। এই অবক্ষয়িত সমাজে শিল্পীর কোনো মর্যাদা নেই। ট্রানজিস্টারে বাজতে থাকা কণিকার গান তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে-

> "সুহাস থু-থু ফেলে,শালা খ্যাল গাতিছে-বলেই চাবি বন্ধ করে।"[২৫]

তাদের প্রতিটি কথাবার্তায় সংস্কৃতির অবমাননা পরিলক্ষিত হয়। বৃদ্ধটি তার শিকড়হীন হওয়ার যন্ত্রণার গল্প বলতে গেলে তেতো ঠেকে ইনামের কাছে, কারণ সে পাশবিকবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য দুটো টাকা জোগাড় করতে পারেনি। দেশবিভাগ পরবর্তী সামাজিক অবনমন হাসান আজিজুল হক এই গল্পে চমৎকার ভাবে চিত্রিত করেছেন।

দেশভাগের পর সামাজিক অবস্থার কীভাবে রদবদল ঘটেছে তার পরিচয় পাই আমরা 'খাঁচা' গল্পে। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে এক হিন্দু পরিবারের দুরবস্থা, অসহায়তার কথা বর্ণিত হয়েছে গল্পমধ্যে। জীবনধারণের জন্য অম্বুজাক্ষ-কে তার কূলবৃত্তি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি বেছে নিতে হয়েছে।

> "অতএব সেতার পশ্চিমের অন্ধকার ঘরে সহায়হীন হয়ে ঝুলে থাকে। অম্বুজাক্ষ বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিওচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ হয়ে যায়"'[২৬]

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবনযুদ্ধে সে পরাজিত সৈনিকের মতো। একদিকে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা অন্যদিকে সে সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি তার সন্তান-সন্ততিদের অন্ধকারের মুখে ঠেলে দেয়। এক উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল ঘুণে ধরা যুবসমাজের সৃষ্টি হয়—

> "বড়োবাবু দাড়িগোঁফ চাঁচতে শুরু করেছেন।এত বড়ো বেহায়া যে বাবার ক্ষুর নিয়ে গেছে চুরি করে।মেজোটি মারামারি করে বেড়ান।তার পরেরটির পাত্তাই নেই।"[২৭]

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি অবলুপ্ত হয় সমাজ থেকে। শিক্ষা-সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়ে। দাদুর পক্ষাঘাত, সংসারের দুর্দশা সূর্য, অরুণের মনে কোনো দোলা দেয় না। দেশভাগ যে এক রুচিহীন সমাজের জন্ম দিয়েছে সেকথা ঘুরে ফিরে এসেছে এই গল্পে। জীবনের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়েছে। বেঁচে থাকা মানে কেবল যন্ত্রণাভোগ করা। তাই সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সাপের ছোবলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—

> "মরে যাব এই তো? বয়ে গেছে বাঁচতে।এই দ্যাখ কলা দেখিয়ে চলে যাব। অরুণ বিরাট অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো আঙুল নাড়াতে থাকে।"[২৮]

—গল্প মধ্যে মূল্যবোধহীন সমাজের চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

'উত্তর বসন্তে' গল্পেও এই অবক্ষয়িত সমাজের ছবি স্বল্প পরিসরে পাওয়া যায়। এ গল্পে এপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া বাণী এবং তার পরিবারের দুর্দশার কথা পাই আমরা। এই গল্পে আমরা দেখি মানুষের ভালোবাসা কীভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। লিপির মৃত্যুর খবর জানতে পেরে তার প্রেমিক কবীর নিরুদ্বেগ। ধুলোজমা পুরনো প্রেমের স্মৃতি আঁকড়ে থাকতে চাইনি সে, নতুন করে আবার শুরু করতে চেয়েছে ভালোবাসার অধ্যায়। মানুষের মূল্য, ভালোবাসার মূল্য অর্থহীন হয়ে পড়ে এই সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে। অন্যদিকে এক বেল্লিক যুবসমাজের চিত্র দেখতে পাই আমরা। বাণীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে গণির মতো লম্পট যুবকেরা প্রেম প্রস্তাব পাঠায় অকুণ্ঠ চিত্তে। হাসান আজিজুল হক দেশবিভাগ পরবর্তীতে সমাজে নৈতিকতার চূড়ান্ত অপমান দেখিয়েছেন আমাদের।

আমরা দেখতে পেলাম দেশবিভাগ পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি। রাষ্ট্রের দায়িত্বহীন ভূমিকা যুবসমাজ-কে অন্ধকার আবর্তের মধ্যে তলিয়ে দিয়েছে। জীবন এবং জীবিকার অনিশ্চয়তা মানুষকে করে তুলেছে নীতিহীন, রুচিহীন। দেশবিভাগ পরবর্তী এই সমাজ মানুষকে নতুন কোনো আশার আলো দেখাতে যে ব্যর্থ, সেকথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পগুলিতে।

৫

হাসান আজিজুল হকের গল্পে দেশবিভাগের অভিঘাত কীভাবে পড়েছে তা আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি এই গবেষণা নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে দেশবিভাগ পরবর্তী ওপার বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার ছবি তেমন পাওয়া যায় না। আমাদের আলোচ্য হাসান আজিজুল হকের গল্পগুলিতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি সেই সংকট। এপার বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি অনেক বেশি গুরুত্ব পেলেও ওপার বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যাও যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেকথা আমরা বুঝতে পেরেছি এই আলোচনায়। দেশবিভাগ পরবর্তীতে 'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'দাঙ্গা' -র স্বরূপ কেমন ছিল তা আমরা বিশ্লেষণ করেছি। হাসান আজিজুল হক কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা কিংবা দাঙ্গার উন্মত্তার পরিচয় দেননি, এর নির্মোক খুলে ফেলে সত্যটিকে সামনে এনেছেন। কেবলমাত্র ধর্মের উপর যে দেশের ভিত্তি স্থাপিত হয় সেই দেশের সামাজিক অচলাবস্থা স্বাভাবিক। নব্যসৃষ্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক অবক্ষয় কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তাও আমরা দেখতে পেলাম।

তথ্যসূত্র :

১. হক, হাসান আজিজুল, 'প্রসঙ্গ কথা', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স
২. হক, হাসান আজিজুল, 'উত্তর বসন্তে', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১৮

৩. তদেব, পৃ. ১৩
৪. তদেব, পৃ. ২১
৫. হক, হাসান আজিজুল, 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই২০১৪(দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ৩৩
৮. হক, হাসান আজিজুল, 'মারী', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৫০
১০. তদেব, পৃ. ৫০
১১. তদেব, পৃ. ৫০
১২. হক, হাসান আজিজুল, 'খাঁচা', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৬৪-৬৫
১৩. হক, হাসান আজিজুল, 'দিবাস্বপ্ন', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৭১
১৪. তদেব, পৃ. ৭২
১৫. তদেব, পৃ. ৭৫
১৬. আনোয়ার, চন্দন (সম্পাদিত), 'জীবনযাপনে সাম্প্রদায়িকতা : দাঙ্গা আর দেশভাগ', *হাসান আজিজুল হক পঞ্চাশটি প্রবন্ধ,* সেপ্টেম্বর ২০২১, কলকাতা, একুশ শতক, পৃ. ৩৬৬
১৭. তদেব, পৃ. ৩৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১৯. হক, হাসান আজিজুল, 'পরবাসী', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৪৩
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'হিন্দুমুসুলমান', *কালান্তর,* পৌষ ১৩৫৫ (পরিবর্ধিত সংস্করণ), কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ৩২৮-৩২৯
২১. হক, হাসান আজিজুল, 'পরবাসী', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৩৭
২২. তদেব, পৃ. ৪২
২৩. চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), 'জীবনযাপনে সাম্প্রদায়িকতা:দাঙ্গা আর দেশভাগ', *হাসান আজিজুল হক পঞ্চাশটি প্রবন্ধ,* সেপ্টেম্বর ২০২১, কলকাতা, একুশ শতক, পৃ. ৩৬৪
২৪. হক, হাসান আজিজুল, 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ২৮-২৯
২৫. তদেব, পৃ. ২৮
২৬. হক, হাসান আজিজুল, 'খাঁচা', *দেশভাগের গল্প*, জুলাই২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৫৭
২৭. তদেব, পৃ. ৬০
২৮. তদেব, পৃ. ৬৩

গ্রন্থপঞ্জি :

১. অশ্রুকুমার শিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০
২. উদয়চাঁদ দাশ(সম্পা), *দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান,* কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৬
৩. চন্দন আনোয়ার, *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য:বিষয় বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫
৪. জয়া চ্যাটার্জি, অনুবাদক- আবু জাফর, *বাংলা ভাগ হল-হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ(১৯৩২-১৯৪৭)*, কলকাতা, এল অ্যালমা পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩
৫. সরিফা সলোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: বিষয় ও প্রকরণ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১০
৬. সানজিদা আখতার, *বাংলা ছোটোগল্পে দেশবিভাগ(১৯৪৭-১৯৭০),* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০২